ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 30-37
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.176

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোট গল্পে নিম্নবর্গীয় চেতনা: এক বিশ্লেষণী পাঠ

রাজর্ষি মোহান্ত, *সহকারী অধ্যাপক, কালিগঞ্জ পাইওনিয়ার কলেজ, শ্রীভূমি, অসম, ভারত*

Received: 15.09.2025; Accepted: 23.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Narayan Gangopadhyay is an unforgettable name in post-Tagore Bengali literature. This distinctive storyteller of the twentieth century shone like a radiant star in the realm of Bengali literature. Among the writers whose pens vividly portrayed the decaying Bengali society of the mid-twentieth century, Narayan Gangopadhyay holds a prominent place alongside Narendra Nath Mitra, Nabendu Ghosh, Mahasweta Devi, and others. During and after the Second World War, Narayan Gangopadhyay enriched Bengali literature with his realistic perspective. His short stories, in particular, reflect the contemporary real-world context, the unrest of the time, and the ideals of life. Narayan Gangopadhya'y works include 14 collections of short stories. He was not merely a popular fiction writer; he was also a great artist who represented an entire era. His true literary development took place against the backdrop of war and famine. His individual voice continuously echoed the hopes and aspirations, sorrows and agonies of an entire era. The disrupted Bengali life during the famine and World War II, the decline of human values, black marketeering, Partition, communal riots, the refugee crisis — all these tragic real-life images were vividly depicted in his stories.

Narayan Gangopadhyay was a believer in Marxist philosophy. His short stories repeatedly highlight the struggles of the voiceless section of Indian society. Just as he sought to awaken the exploited, deprived, and marginalized working class of society. He also highlighted the various crises faced by these people in his short stories. Particularly, he portrayed the lives of the lower classes with a realistic and insightful perspective. His short stories silently bear witness to the exploitation of the lower-class people by the wealthy elites, moneylenders, and custodians of the law.

Keywords: Narayan gangapadhyay, subaltern, famine, starving, foodless

রবীন্দ্র উত্তর বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় নাম হলো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ শতকের এই স্বতন্ত্র কথা শিল্পী বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দেদীপ্যমান। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার অবক্ষয়িত সমাজ চিত্র যেসব লেখকদের কলমে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন তাঁর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিমায়। বিশেষত তাঁর ছোট গল্পগুলি সমকালীন বাস্তব প্রেক্ষাপট, অশান্ত সময় ও জীবনাদর্শের প্রতিচ্ছবি। মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বিপর্যস্ত বাঙালি জনজীবন, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, কালোবাজারি, স্বার্থের সংঘাত, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতির

নানা বাস্তব করুন দৃশ্য তাঁর গল্পে মুর্ত হয়ে উঠছে। বিশেষত নিম্নবর্গীয় সমাজ ও তাদের জীবন বীক্ষণ অত্যন্ত বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি তুলে ধরেছেন।

১৩২৫ বঙ্গাব্দে, ইংরেজি ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বালিয়া ডিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন পুলিশ কর্মকর্তা। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বরিশালের বাসুদেব পাড়ায়। বাল্য কাল থেকেই তিনি মেধাবী ও কৃতি ছাত্র ছিলেন। দেশপ্রেম, রাজনৈতিক চেতনা ও প্রতিবাদী ধারা তাঁর মনে বাল্য কালেই অঙ্কুরিত হয়। তাঁর শিক্ষাকাল কাটে দিনাজপুর, ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ, বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ ও কলকাতায়। তিনি ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে M.A. পাশ করেন এবং ১৯৬০ সালে ডক্টরেট্ ডিগ্রি নেন। এরপর তিনি জলপাইগুড়ি কলেজ, সিটি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। শৈশবেই তাঁর সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। তাঁর পিতা পুলিশের দারোগা হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। তদানীন্তন বাংলা দেশের যত রকম দৈনিক, সাপ্তাহিক আর মাসিক পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন তিনি। শুধু গ্রাহক বললে ভূল হবে, একজন একনিষ্ঠ পাঠকও ছিলেন। তাঁর পরিবারের ছোটোদের জন্য আসত খোকাখুকু, সন্দেশ, মৌচাক, শিশুসাথী প্রভৃতি পত্রিকা গুলি। সেখান থেকেই তাঁর সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আগ্রহ জন্মায়। আর অতি অল্প বয়স থেকেই গল্প, উপন্যাস, কবিতা লেখা শুরু করেন। তিনি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে 'মাস পয়লা' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় ছোটোদের বিভাগে কবিতা লিখে পুরস্কার ও পেয়েছিলেন। কাব্য চর্চার মাধ্যমেই তাঁর সাহিত্য জগতে পদার্পণ। দেশ, শুকতারা, পাঠশালা, সন্দেশ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি একাধিক পত্রিকায় তাঁর অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উননিবেশ' (অখণ্ড) ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প সংকলন হলো 'বীতংস'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের প্রায় ১৪ টি সংকলন পাওয়া যায়। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্প সংকলন হল-

'বীতংস' (১৯৪৫), 'কালাবাদর' (১৯৪৫), 'দুঃশাসন' (১৯৫২), 'ভোগবতী' (১৯৪৫) ।

তিনি জীবনে প্রায় শতাধিক গল্প লিখেছেন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্প হল–

'ইতিহাস','টোপ','সৈনিক','জান্তব','কালোজল','রেকর্ড','হাড়','পুষ্করা','নক্রচরিত্র', 'দুঃশাসন', 'সভাপতি' প্রভৃতি। এগুলো ছাড়াও তাঁর সাহিত্যের একটি বিরাট জায়গায় জুড়ে আছে কিশোরদের জন্য লেখা গল্প ও উপন্যাস। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কিশোর গল্পের নাম হল- 'মৎস-পুরাণ', 'ভুতুড়ে', 'খট্টাঙ্গ ও পলান্ন', 'রোমাঞ্চকর বন্দুক', 'থলে রহস্য' ইত্যাদি। কয়েকটি কিশোর উপন্যাস হল- 'অন্ধকারের আগন্তুক'(১৩৫২), 'চারমূর্তি'(১৯৫৭), 'চারমূর্তির অভিযান'(১৯৬০) । অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিশোর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তিনি "রঞ্জিত স্মৃতি পুরস্কার" লাভ করেন। এছাড়া তাঁর অসামান্য সাহিত্য কীর্তির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক, এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আয়োজিত 'আনন্দ পুরস্কার' ও পান। ২২শে কার্তিক, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে, ইং ৬ই নভেম্বর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে সমসাময়িক যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় শিল্পী বলা যায়। মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তরের পটভূমিতেই তাঁর যথার্থ বিকাশ। যার ব্যক্তি কণ্ঠে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয়েছে সমগ্র যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ বেদনার মর্মগাথা। তিনি মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। লেখক সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের জীবন যন্ত্রণা তথা মন্বন্তর কবলিত বাংলার নিরন্ন, বিবস্ত্র মানুষের গগনভেদী হাহাকারকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন খুব কাছে থেকে। তাই তাঁর সৃষ্টিতে সমাজ মানসের ভাববেদনা বানীবিগ্রহ লাভ করেছে। অনেক সমালোচকেরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিখ্যাত লেখক মাক্সিম গোর্কির সাথে তুলনা করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন–

> "নারায়ণ শুধু প্রতিভাবানই নন, সমসাময়িক যুগের প্রতিনিধিস্থানীয়ও বটেন।...ছোটগল্পে বঙ্গভারতী আজ ষড়ৈশ্বর্যময়ী, এই বিরাট ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মহত্তর সমৃদ্ধির সম্ভাবনাকে তিনি ভাষা দিয়েছেন।"[১]

বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটা অংশ জুড়ে আছে সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের কথা, তাঁদের জীবন সংগ্রামের কথা। মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তরের সময়ে অবক্ষয়িত মূল্যবোধ ও পরিবর্তিত জীবনাদর্শের প্রেক্ষিতে সমসাময়িক কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাসে বারবার উঠে এসেছে সাবালটার্নদের প্রসঙ্গ। মানিক, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ,

সুকান্ত,বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে মহাশ্বেতা দেবী প্রত্যেকেই প্রান্তিকায় দলিতদের নিয়ে কলম ধরেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়ও সমাজের সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বেদনাহত চিত্র ধরা পড়েছে এভাবে—

> "শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
> প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা ।"[২]

আর এই শতাব্দী লাঞ্ছিত, শোষিত আর্তের হাহাকারই যেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের প্রাণ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পেও বার বার উঠে এসেছে নিম্নবর্গীয় জীবন বীক্ষনের সংগ্রাম। সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষকে তিনি যেমন জাগাতে চেয়েছেন, তেমনি তাঁর ছোটগল্পে উঠে এসেছে এই শোষিত বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নানা সংকটের কথা। সমাজে যারা দিনের পর দিন অত্যাচারিত, শোষিত, বঞ্চিত, তারা চিরদিনই শোষিত হয়েই থেকে যায়। যাদের আর্তনাদ পৌঁছায় না সমাজের উচ্চ শ্রেনী তথা সভ্য বলে খ্যাত মানুষদের কাছে, সমাজ যাদের বাতিলের খাতায় রাখে, সেই সাবালটার্নদের তিনি ঠাই দিয়েছেন হৃদয়ে, মননে। তাঁর 'হাড়', 'বীতংস', 'নক্রচরিত্র', 'দুঃশাসন', 'পুস্করা', 'টোপ' প্রভৃতি নানা গল্পে সমাজে নিম্নবর্গীদের অবস্থান সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এমনই একটি গল্প হল 'বীতংস'। এই গল্পে আসামের চা বাগানে আরকাটির মাধ্যমে শ্রমিক পাচারের করুন ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এই আরকাটিরা বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশের প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে। গল্পে 'সুন্দর লাল' ভণ্ড সাধু সেজে সাঁওতাল পাড়ায় প্রবেশ করে। সে অনায়াসেই নিরীহ সাঁওতালদের বিশ্বাস অর্জন করে। সে নিজেকে সিদ্ধ পুরুষ বলে জহির করে। ঝাড়ফুঁক, ভূত তাড়ানো, পিশাচ চালানে সে সিদ্ধহস্ত। উদার প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা সাঁওতালদের কাছে এসে হয়ে উঠে বাবা ঠাকুর। সুন্দর লাল সংসার ত্যাগী বৈরাগী সাজলেও তার মনে থাকে তীব্র ভোগ লালসা। নৃত্যরত সাঁওতাল কন্যা বুধুনির সর্বাঙ্গে বিচরণ করে তার লোলুপ দৃষ্টি। ঝুড়ু সাঁওতালের মেয়ে বুধনিকে সে স্বপ্ন দেখায় শহরের রঙ্গিন জীবনের।

> "চলে যা, চলে যা তুই! দেবতার নাম করে বলছি, তুই চলে যা। শাড়ী, চুড়ি, তেল—যা চাস সব পাবি।"[৩]

কিন্তু শাড়ি চুড়ি, আর তেলের বিনিময়ে বুধনীকে যে কতটা মুল্য দিতে হবে তা সহজ সরল আদিবাসীরা বুঝতে পারেনা। গ্রামের মানুষ তাকে ভগবানের মত শ্রদ্ধা করে। ধর্মকে অস্ত্র করে সুন্দর লাল তাদের উপর আধিপত্য বিস্তারের সম্মতি আদায় করে। তারপর একদিন, বিনি সাঁওতালির মানসিক পূজার দিন, তার উপর শিং-বোঙার ভর করার ভান করে এবং গ্রামে মোড়ক লাগার ভবিষ্যৎবাণী করে।

> "ঝড়ু সাঁওতাল, শুনছিস? আমি শিং-বোঙা, তোদের ডাকছি—শুনছিস?... —আমার কথা শোন্। তোদের গাঁয়ে মড়ক লাগবে—হয়জার মড়ক! —একটি প্রাণীও বাঁচবে না মরে সব শেষ হয়ে যাবে। 'করম' দেবতার রাগ পড়েছে, তোদের কাউকে রাখবে না, কাউকেই নয়।"[৪]

করম দেবতার ভয় দেখিয়ে সাঁওতালদের ঘরবাড়ি ছাড়ার জন্য বলে। সাঁওতাল পাড়ার নিরীহ মানুষেরা তাকে বিশ্বাস করে। সেই বিশ্বাসের সযোগ নিয়ে গ্রামের মানুষদের সে নির্মমভাবে ঠকিয়ে নিয়ে যায় আসামের চা বাগানে। সুন্দরলাল তাদের লোভ দেখায়-

> "সেখানে ঘর পাবি, জমি পাবি, এরচেয়ে অনেক সুখে থাকবি।"[৫]

অসহায় সাঁওতালরা একপ্রকার বাধ্য হয়েই তার সঙ্গ নেয়। ঘর বাড়ি ছেড়ে ছুটে চলে অনিশ্চিত জীবনের পানে। ঘর ছাড়ার দুঃখ থাকলেও নুতুন জীবনের স্বপ্নে, দুবেলা দুমুঠো ভাতের আশায় তারা সুন্দর লালের দেখানো পথে হেঁটে চলে–

> "—একটা অস্ফুট গানের গুঞ্জন। সাঁওতাল পুরুষেরা ঘর ছাড়ার দুঃখ ভোলবার জন্যেই কেউ হয়তো বাঁশিতে সুর দিয়েছে। মেয়েদের মুখে কোনো ক্ষোভের ইঙ্গিত নেই। পথ চলবার আনন্দে তারা লীলায়িত, মাদলের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কালো চুলে শাদা ফুলের মঞ্জরিগুলি দুলে উঠছে। বুধনীর চোখে স্বপ্ন। শহর, চুড়ি, তেল আর শাড়ী।"[৬]

অন্যদিকে আরকাটি সুন্দর লাল মনে মনে হিসাব করে—

> "বধুনীকে বাদ দিলে, বেয়াল্লিশ জন কুলিতে তার কমিশন পাওয়া হয় কত!"[৭]

বীতংস শব্দের অর্থ হল পাখী বা হরিণ ধরার ফাঁদ। সুন্দরলালও গল্পের শুরু থেকে যে ফাঁদ পাতে, গল্পের শেষে দেখতে পাই সবাই তার ফাঁদে পা দেয়। এভাবেই সুন্দরলালের মতো আরকাটিরা দক্ষ শিকারীর মতো ফাঁদ পেতে নিরীহ মানুষদের শ্রমিক হিসাবে চালান করে। আর 'শহর চুড়ি, তেল আর শাড়ির' স্বপ্ন দেখে বুধনীর মত হাজার হাজার মেয়ে কালের স্রোতে হারিয়ে যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আরো একটি করুণ গল্প হল 'দুঃশাসন'। গল্পটি মনন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত। আলোচ্য গল্পে ও সমাজের দুটো শ্রেণীর মানুষকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। একদিকে উচ্চবিত্ত শ্রেনীর প্রতীক হিসাবে আছে দেবী দাস, থানার বড়বাবু শচীকান্ত প্রভৃতি চরিত্ররা। অন্য দিকে সর্বহারা, অর্ধনগ্ন বুভুক্ষুর দল। গল্পের শুরুতেই দেখতে পাই, একজন লোক দেবী দাসের পা ধরে কাঁদতে কাঁদতে একটুকরো কাপড়ের জন্য অনুরোধ করছে।

"অন্তত এক জোড়া কাপড় নইলে আর—"[৮]

দেবী দাসের বিরাট কাপড়ের আড়ত আছে। গোদাম ভর্তি কাপড় থাকা সত্ত্বেও অসহায় লোকটাকে সে এক জোড়া কাপড়ও দিতে চায় না। যুদ্ধের বাজারে আকাল পড়েছে। কয়েকদিন পর কাপড় বেশি দামে বিক্রি করা যাবে, ভালো মুনাফা হবে। তাই সব দোকানে তালা দিয়েছে। অন্যদিকে থানার বড়বাবু নিশিকান্তের আয়োজিত যাত্রাপালা 'দুঃশাসনের রক্তপান'-এর জন্য ৫০ টাকা চাঁদা দিতে পারে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খুব সুন্দর ভাবে শোষক শ্রেণী আর শোষিতদের জীবন চিত্র মূর্ত করে তুলেছেন। একদিকে যাত্রা পালায় আলোর বাহার, অন্যদিকে রাতের আঁধারে পুত্রের প্রাণ রক্ষার্থে সামান্য আলো জ্বালাতে না পারা অসহায় জননীর হৃদয় বিদারক ক্রন্দন। মুছি পাড়ায় রাতের অন্ধকারে শিয়াল একটি শিশুকে নিয়ে গেছে এবং ঘরের পাশে বসেই খেয়েছি। কিন্তু সামান্য আলোর অভাবে শিশুটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

> "পরদিন সকালে বাড়ী থেকে ত্রিশ হাত দূরেই ছেলের অভুক্ত মাথাটা পাওয়া গেছে। এত কাছে বসে খেয়েছে, অথচ একটা আলোর অভাবে ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না।"[৯]

এই মর্মান্তিক ঘটনার বর্ণনা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ হয়তো এত প্রাঞ্জল ভাষায় দিতে পারতেন না। কেরোসিনের অভাবে পুরো গ্রাম যেখানে অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেখানে 'ডে laight' জ্বালিয়ে ভিমসেনের "রক্তাক্ত হাতে দ্রুপদ-নন্দিনীর বেণী"[১০] বেঁধে দেওয়ার দৃশ্য দেখছে আধুনিক বাংলার দুঃশাসনেরা।

গল্পের শেষ ভাগ আরো মর্মান্তিক। যাত্রা পালা শেষ করে দেবীদাস মুচি পাড়ার লক্ষণ মুচির খবরে তাঁর বাড়িতে যায়। সেখানে ঘটে এক বিচিত্র ঘটনা– একটি নগ্ন মেয়ে ঘাটের দিক থেকে জল নিয়ে আসছিল। মানুষের সাড়া পেয়ে নিমিষে উধাও হয়ে যায়।

> "মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে একফালি কাপড় নেই — কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।"[১১]

যুদ্ধের বাজারে নিজের লজ্জা নিবারণের ন্যূনতম এক টুকরো কাপড় কেনার সামর্থ্য নেই। এ দৃশ্য কেবল মাত্র মুচি পাড়ার নয়; ৫০-এর মমন্তরের সময় বাংলার প্রত্যেক পাড়ার, প্রত্যেক ঘরের দৃশ্য। অসহায়, শোষিত, বঞ্চিত মানুষগুলির অবস্থা বোঝার জন্য শুধুমাত্র 'কোনো খানি একফালি কাপড় নেই' কথাটিই যথেষ্ট। আর সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রতীক কাপড়ের আড়তদার দেবী দাসের মতো ব্যবসায়ীরা শুধু মাত্র বাংলার নয়, একটি যুগের 'দুঃশাসন'।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'হাড়' গল্পটি পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত। মন্বন্তরের সময়ের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন গল্পটিতে। গল্পে আমরা দেখতে পাই, নায়ক চাকরী প্রার্থী বেকার যুবক, বুকে এক রাশ আশা নিয়ে রায় বাহাদুরের বিশাল প্রাসাদের ফটকে উপস্তিত হয়। পিতার দেওয়া একটি চিটি নিয়ে সে পিতৃবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। রায় বাহাদুর এইচ এল চ্যাটার্জি বিরাট প্রাসাদের ভেতরে থাকেন। এর ফটকের ভিতরে বিশাল দর্শন দুটো কুকুর দেখে তার ভিতরে ঢুকার সাহস হয় না। সে সামনে পায়চারি করতে থাকে। তারপর একটা সময় রায় বাহাদুরের ষড়শী কন্যা সুষির সহায়তায় রায়বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটে। পিতার দেওয়া চিঠিটি গল্পকথক রায় বাহাদুরকে দেন। চিঠি পড়ে রায় বাহাদুর ছেলেটির পরিচয় জানতে পারেন; ফরিদপুরের ঈশান স্কুলে পড়া তার সহপাঠী প্রমথের ছেলে। রায়বাহাদুর তার বন্ধু প্রমথের প্রচুর প্রশংসা করেন। কিন্তু তিনি এই যুদ্ধের বাজারে একটি মধ্যবিত্ত যুবকের সামান্য কেরানীর চাকরীর কতটা দরকার তা তিনি অনুধাবন করতে পারেন না। তিনি প্রায় ধমকের সুরে

যুবকটিকে প্রত্যাখ্যান করে তার জীবনের এডভেঞ্চারের গল্প শোনাতে শুরু করেন। তারপর তিনি যুবকটিকে তার ভ্রমণের ইতিহাস বলতে থাকেন। বলতে থাকেন তার ফিলিপাইন, ম্যানিলা,তাহিতি, দ্বীপে গিয়ে আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা। তার সংগ্রহ করা বিচিত্র সব হাড়ের টুকরো গুলো দেখাতে থাকেন। ৫০০০ টাকা দিয়ে তিনি একটা 'রেডোশিয়ান' এর হাড় কিনে আনেন কাটুবাটু থেকে। তাহিতি দ্বীপে কুমারী মেয়েকে বলি দিয়ে তৈরি করা হাড় ও রয়েছে। ঠিক সেই সময়ে বাইরে থেকে ভেসে আসে নিরন্ন বুভুক্ষুদের চিৎকার,-

"...চাট্টি ভাত দাও মা...একটুখানি ফ্যান"[১২]

যা তার বিরক্তির উদ্রেক করে। মনোহর পুকুর পার্কের পাশে অসহায় নিরন্ন মানুষগুলি সামান্য ভাতের ফ্যানের জন্য হাহাকার করতে থাকে। রাসবিহারী এভিনিউ এর কোলাহল চাপিয়ে কানে আসে ক্ষুধার্তের হাহাকার। কিন্তু তা চাপা পড়ে যায় রায়বাহাদুরের মতো মানুষের আপাত জীবন সত্যের আড়ালে। সেই সময় গল্প কথক যুবকটির মনে হয়-

"তাহিতি দ্বীপে মানুষ পুড়ছে না, পুড়ছে কলকাতায়!"[১৩]

নারায়ণ গঙ্গপাধ্যায় সমাজের তিনটি শ্রেনীর চিত্র তুলে ধরেছেন গল্পটিতে। সমাজে উচ্চ শ্রেনীর প্রতিনিধি রায়বাহাদুর। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতীক চাকরী প্রার্থী বেকার যুবক। আর নিম্ন শ্রেণির প্রতীক মনোহর পুকুর পার্কের ফুটপাতে আশ্রয় গ্রহণ করা মন্বন্তর কবলিত অসহায় বুভুক্ষু মানুষ গুলো। নারায়ণ গঙ্গপাধ্যায় একই সমাজিক পরিবেশে তিনিটি শ্রেনীর মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সমাজের উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি রায় বাহাদুরের জীবনের প্রতিটি অধ্যায় বিলাসিতায় পরিপূর্ণ, বাস্তব জীবন চিত্র তার চোখে পড়ে না। হাতে যার বিলাস বহুল হীরার আংটি, যার 'হবি' বিভিন্ন ধরনের 'হাড়' সংগ্রহ করা; তার কাছে অসহায় বুভুক্ষুদের চিৎকার বিরক্তিকর মনে হয়। তিনি বলেন-

"...পার্কের ওই ডেসটিচ্যুটগুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমানো যায় না।...খেতে না পেলে চীৎকার করবে, খেতে পেলেও তাই ।"[১৪]

ঘরে বিলাসীতা করে কুকুর পোষতে পারেন, কিন্তু ডাস্টবিনে পড়ে থাকা পচা দুর্গন্ধময় খাবারের জন্য সংঘর্ষ করা মানুষের কথা তিনি ভাবেন না। রায়বাহাদুর হয়তো পারতেন মানবিক জাদুকাটির স্পর্শে কলকাতার বুকে জ্বলতে থাকা বুভুক্ষার লেলিহান শিখা থামাতে। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্পে সে আশার আলো জ্বালিয়ে তুলেননি।

এক বুক হতাশা নিয়ে গল্পকথক যুবকটি যখন রায় বাহাদুরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তখন দেখতে পায় নোংরা ডাস্টবিনের মধ্যে খাবার খুঁজছে ক্ষুধার্ত মানুষগুলি। আর পার্কের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে একটি কঙ্কালসার ছেলে হাড় চুষে চলেছে।

"... একটা ছোট ছেলে দু'হাতে কী চুষছে প্রাণপণে। হাড়? হাঁ, হাড়ই তো।"[১৫]

মন্বন্তরের একটি রুক্ষবাস্তব চিত্র আমরা এখানে দেখতে পাই। আলোচ্য গল্পে একদিকে বিলাসবহুল রায় বাহাদুরের সৌখিন হাঁড় আর অন্যদিকে ক্ষুধার্তের শেষ সম্বল ডাস্টবিনের হাড়। সুতরাং 'হাড়' নামটিও এখানে যেন ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে এবং নামকরণটিও এখানে স্বার্থক হয়ে উঠেছে। শুধু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নয়, সমকালীন অনেক লেখকদের কলমে কি চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকেও আমরা কুঞ্জকে দেখি কুকুরের সঙ্গে খাবার ভাগ করে খাচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে লেখা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নক্রচরিত্র' গল্পে সমাজের তিমিরাচ্ছন্ন নির্মম সত্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'নক্রচরিত্র' গল্পের নায়ক গোলাপাড়া হাটের নিশিকান্ত কর্মকার একাধারে আড়তদার, ব্যবসায়ী এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। সে একদিকে গলায় তুলসী মালাধারী বৈষ্ণব আবার অন্যদিকে ডাকাতের ও মদতদাদা। ডাকাতেরা রাতের অন্ধকারে ছিনতাই করা মাল তার কাছে বিক্রি করে যায়। নিশীকান্ত ডাকাতদের ঠকিয়ে অল্প মূল্যে দামী দামী মাল আত্মসাৎ করে। ডাকাতের উপর বাটপারি করা সোনা দিয়েই ভরাট করেছে তার লৌহ সিন্দুক। আবার যুদ্ধের বাজারে অধিক মুনাফা লাভের জন্য আড়তে শত শত মন চাল ও লুকিয়ে রাখে; যার ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের আকাল পড়ে। বিগত যৌবন এবং বিকারগ্রস্ত হলেও সে প্রচন্ড লোভী এবং ধূর্ত। ইব্রাহিম দারোগার মতো প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কৌশলে সে বশ করে রাখে। তার কুকর্মের ফলে মতিপালের মতো মানুষদের না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করতে হয়। কিন্তু তাতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না।

মতিপালের পরিবার যেখানে ধ্বংস হয়ে যায়, সেখানে নিশী হরি সভায় কৃষ্ণ নাম শ্রবণে মত্ত। সত্যিকার অর্থেই সে নক্রবৎ।

গল্পটিতে লেখক নিশিকান্তকে শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তুলেছেন। গল্পে নিশিকান্ত ছাড়াও আইন ও শান্তির রক্ষক ইব্রাহিম দারোগাও শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আশ্রিত বিশাখা, মদন ডাকাত, যোগী, মতিপাল, মতিপালের বউ, প্রভৃতি চরিত্রগুলি নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে। এরা প্রত্যেকেই শোষিত, বঞ্চিত। মদন, যোগী বাধ্য হয়ে ডাকাতির পথ বেছে নিয়েছে। দুবেলা দুমুঠো ভাতের তাগিদে 'কষ্টবালা'র মতো অসহায় নারীর হয়তো, 'বিশাখা' সেজে নিশিকান্তের বৃন্দাবন লীলার সঙ্গী হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

অতিলোভী মহাজন নিশিকান্ত বিগত যৌবন হলেও তার যৌন স্পৃহা বর্তমান। সে বিশাখাকে তার সেবা দাসী হিসাবে রেখেছে। ইব্রাহিম দারোগাকে হাতে রাখার জন্য বারংবার বিশাখাকে ব্যবহার করেছে। তবে বিশাখা নিজের ভাগ্যের সাথে আপোষ করে গুল্মের ন্যায় নিশিকে আঁকড়ে বেঁচে থাকাই শ্রেয় মনে করেছে। একদিকে নারী লোলুপতা, ধর্মের ভন্ডামী, অর্থের লোভ, সবকিছু মিলিয়ে নিশিকান্ত হয়ে উঠছে সত্যিকারের নক্র। যুদ্ধের বাজারে অতিরিক্ত মুনাফার আশায় আড়তে ৮০০ মন চাল মজুত করে রেখেছে। বারো টাকা দরে কিনেছে, দাম বাড়লে ৪০ টাকা করে বিক্রি করতে পারবে।

> "বারো টাকা দরে কেনা, বর্ষার বাজারে অন্তত চল্লিশে ছাড়া চলবেই। দু চারজন লোক তো এর মধ্যেই আনাগোনা সুরু করেছে, মিলিটারীর কন্ট্রাক্ট নাকি পেয়েছে তারা; টাকার জন্যে আটকাবে না...।"[১৬]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাজারে বাংলার মহাজনরা কিভাবে আড়তে খাদ্যশস্য মজুত করে দেশে খাদ্যাভাবের সৃষ্টি করেছিল, তার জলজ্যান্ত উদাহরণ এই গল্পটি। আড়তে প্রচুর চাল থাকা সত্ত্বেও বাজারে চালের আকাল পড়েছে। আসলে সমাজে না খেতে পাওয়া মানুষগুলো কি নিদারুণ যন্ত্রণাই না ভোগ করছে, তা নিশিকান্তের মতো চরিত্রদের চোখেই পড়ে না। আলোচ্য গল্পে আমরা দেখতে পাই, সকল মহাজনেরা মিলে বিশাল আড়ম্বর করে হরিসভায় অষ্টপ্রহর কীর্তনের আয়োজন করেছে। বৈষ্ণব ভোজনের জন্য বড় হাঁড়িতে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। আর সেই সময় আসর জমে আসতে না আসতেই ইউনিয়ন বোর্ডের চকিদার, মতি পাল ও তার স্ত্রীর মৃত্যু খবর নিয়ে এসেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিশিকান্তকে মড়া দেখার জন্য যেতে হয়। চৌকিদার নিশিকান্তকে জানায়, ক্ষুধার জ্বালায় অভুক্ত মতিপাল মাটি কামড়ে মারা গেছে। চালের আকাশ ছোঁয়া বাজারে সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালির পক্ষে গ্রাসাচ্ছাদন যে কতটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। ভাতের ফেনের জন্য যেখানে মানুষ শহরের নালার পাশে বসে থাকতো, সে জায়গায় ভিক্ষা দেওয়ারতো প্রশ্নই ওঠে না। এই অপ্রিয় সত্যটাই চৌকিদারের কণ্ঠে শোনতে পাই-

> "...না খেয়ে মরেছে। আগে ভিক্ষে করত, তিরিশ টাকা চালের বাজারে কে ভিক্ষে দেবে এখন? বৌটাও আর পেটের জ্বালা সইতে পারেনি, তাই গলায় দড়ি দিয়েই ঝামেলা মিটিয়েছে।"[১৭]

ক্ষুধার অসহ্যকর জ্বালায় কাতর গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের যে নিদারুণ বর্ণনা লেখক তুলে ধরেছেন, তা সত্যিই বিভীষিকাময়। দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে জীর্ণশীর্ণ রুগ্ন মতি পাল বারান্দায় পড়ে আছে। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত অসহায় মতিপাল মাটি কামড়ে খেয়েছিল। বারান্দায় পড়ে থাকা মৃতদেহের মুখে কাদামাখা বমি লেগে আছে।

> "পেটের জ্বালায় দাওয়া থেকে বুঝি খানিকটা মাটি কামড়ে খেয়েছিল, একরাশ কর্দমাক্ত বমি গালের দুপাশে জমে রয়েছে। পুরো বত্রিশটা দাঁতই তার বেরিয়ে আছে...।পেটটা লেপ্টে রয়েছে পিঠের সঙ্গে; কালো কালো নগ্ন পা দুটোকে দেখাচ্ছে অস্বাভাবিক দীর্ঘ-যেন ভূতের পা ।"[১৮]

আর তার চেয়েও মর্মান্তিক মতিপালের বউয়ের মৃত্যু দৃশ্য। সদর দরজা দিয়ে লন্ডনের আলো পড়তেই চমকে উঠে। লজ্জা নিবারণের শেষ আবরণটুকু গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলেছে—

> "শেষ সম্বল লজ্জাবাস দিয়েই গলায় ফাঁস পরিয়েছে— লণ্ঠনের আলোয় সেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অস্বাভাবিক নারীদেহটা একটা দানবীয় বিভীষিকা যেন।"[১৯]

আর এরজন্য দায়ী নিশিকান্তের মতো মুখোশধারী ভণ্ড চরিত্ররা। আড়তে চাল, কাপড়, ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গেলেও মনে মনে শুধু মুনাফার হিসাব করতে থাকে। মৃত্যু উপত্যকার বিভীষিকায় তাদের মনের বিকার নিবৃত্ত হয় না। ক্ষুধার্ত জন মানুষের হাহাকার তাদের বিশাল দালানের প্রাচীর ভেদ করতে পারেনি।

নিশির মত মানুষেরা নিজের ক্ষমতার জোরে সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অন্ন, তাদের জীবন, নিজের লোভের ভান্ডারে জমিয়ে রেখেছে। আশাহারা, ভাষাহারা, অসহায় জাতির কলঙ্ক সরূপ নিশিকান্তের মতো মহাজনেরা। গল্পে নিশিকান্ত নারকীয় মৃত্যু যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করেছে খুব কাছে থেকে। তবুও তার বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হয় না। আসলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের চরিত্ররা নিজের সামাজিক অবস্থানে অনড়। তাঁর নিম্নবর্গীয়রাও কোথাও বিশেষ একটা প্রতিবাদ করেনি। তাঁর আপাত নিরীহ চরিত্ররা ক্ষুধার জ্বালায় নির্বিকারে হাড় চুষেছে ডাস্টবিন থেকে তুলে, অথবা ভাগ্যের সাথে আপোস করে 'সুন্দরলাল' এর সাথে পাড়ী দিয়েছে অজানা অন্ধকার জগতে। এছাড়াও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' গল্পেও আমরা দেখি কিভাবে একটি শিশুকে বাঘের টোপ হিসাবে ব্যবহার করেছেন রাজবাহাদুর। 'পুষ্করা' গল্পেও শিবা ভোগ খেয়ে ডোম পাড়ার পাগলি রাস্তায় পড়ে আছে। মূলত সমাজের সেই বিচ্ছিন্ন নগ্নরূপ পাঠকের সামনে তুলে ধরাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে নিম্নবর্গীয় চেতনার যে প্রবাহ দেখা যায়, তা বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ দিক নির্দেশ করে। তাঁর রচনায় শহর ও গ্রামবাংলার প্রান্তিক মানুষদের জীবনযাত্রা, সংগ্রাম, আনন্দ-বেদনা অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় উঠে এসেছে। তিনি সাধারণ মানুষের কথাই বলেছিলেন—যাঁদের অস্তিত্ব উচ্চবর্গের চোখে তুচ্ছ, অথচ যাঁরা সমাজের মূল চালিকাশক্তি। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের নির্মম বাস্তবতা মূর্ত হয়ে উঠছে তাঁর ছোট গল্পের মধ্যে। তাঁর চরিত্রেরা প্রায়ই অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার, কিন্তু তারা শুধুই করুণ নয়—তারা প্রতিবাদী, তারা নিজের মতো করে টিকে থাকার চেষ্টা করে। মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী লেখক নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনের গভীরতর সংকট, অভাব, অসম্মান ও তাদের লড়াই করার অসামান্য মনোবলকে অত্যন্ত সংবেদনশীল দৃষ্টিতে দেখেছেন। মন্বন্তর এবং যুগের অবক্ষয় নিয়ে পরবর্তী সময়ে লেখকরা গল্প লিখলেও, তাঁর গল্প উত্তর কালের লেখকদের সর্বদাই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। সেজন্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আজও পাঠক সমাজে অম্লান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পাদনা)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রকাশ ভবন, কলকাতা, মাঘ, ১৪২৬, পৃ. ৫।
২. দে, সুধাংশু শেখর। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৫।
৩. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পাদনা)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রকাশ ভবন, কলকাতা, মাঘ, ১৪২৬, পৃ. ২৩।
৪.তদেব, পৃ.২৮।
৫.তদেব, পৃ. ২৮।
৬.তদেব, পৃ. ২৯।
৭.তদেব, পৃ. ২৯।
৮. তদেব, পৃ. ৫১।
৯. তদেব, পৃ. ৫৪।
১০.তদেব, পৃ. ৫৭।
১১.তদেব, পৃ. ৫৮।
১২.তদেব, পৃ. ৩৬।
১৩. তদেব, পৃ. ৩৬।
১৪. তদেব, পৃ. ৩৪।
১৫. তদেব, পৃ. ৩৭।

১৬. তদেব, পৃ. ৪৬।
১৭. তদেব, পৃ. ৪৮।
১৮. তদেব, পৃ. ৪৯।
১৯. তদেব, পৃ. ৪৯।

আকর গ্রন্থ:

১. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পাদনা)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রকাশ ভবন, কলকাতা, মাঘ, ১৪২৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, ড. অভিজিৎ (সম্পাদনা)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: ছোটগল্পের রূপকার। কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২রা এপ্রিল ২০১৫।
২. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। সমগ্র কিশোর-সাহিত্য প্রথম খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৮০।